

## নিবেদন

ছোটবেলা থেকেই হাস্যরসের গল্পের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প পড়ে ভারি ভালোলাগত। তারপর দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘কুস্তীর বিভ্রাট’ গল্পটি পড়তে হয়েছিল পাঠ্যক্রমে থাকার সুবাদে। এ গল্পটি পাঠ করে হেসে ওঠে না এমন পাঠক বোধহয় একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এরপর উচ্চমাধ্যমিকে পড়াকালীন পরশুরামের বিখ্যাত ছোটগল্প ‘বিরিঞ্চিবাবা’ পড়তে হয়েছিল। হাসির গল্প হিসেবে বাংলা সাহিত্যে এ গল্পটি যথেষ্ট জনপ্রিয়। ‘বিরিঞ্চিবাবা’ গল্পটি পাঠ করতে গিয়েই মনে হয়েছিল যে গল্পটিতে হাসি আছে ঠিকই কিন্তু এর মধ্য দিয়ে লেখক আসলে সমাজের বিভিন্ন অসংগতিক তুলে ধরেছেন। হিন্দুসমাজের ধর্মভক্তির আড়ালে যে কত বড় ভন্ডামি লুকিয়ে থাকে তাকে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে লেখক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এরপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ পড়ার সময় ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের হাস্যরসের গল্প পড়ার সুযোগ হয়। এ গল্পগুলি পাঠ করে মনে হয় এগুলি হাস্যরসের গল্প ঠিকই কিন্তু সবগুলি গল্পের হাসি একই ধরনের নয়। কোথাও রয়েছে বিদূষের বক্র হাসি, কোথাও বা নির্মল কৌতুক আবার কোথাও সে হাসি কান্না মেশানো। শুধু তাই নয় গল্পগুলির হাস্যরসের বিষয়ও আলাদা। কেন এমন হয়? কীভাবে এমন হয়? এ প্রশ্নগুলি মনের কোণে উকি দিতে থাকে। তখন থেকেই বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করার প্রবল উৎসাহ অনুভব করি। আমি প্রথমেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় অক্ষয় ভট্ট মহাশয়কে বিষয়টি নিয়ে আমার উৎসাহের কথা জানাই। তিনিই প্রথম আমাকে এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করেন। পরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায়ের বিশেষ সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে গবেষণার জন্য বাংলা সাহিত্যের তিন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত তিনজন হাস্যরসিক শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে বেছে নেই। এই তিনজন হাস্যরসিক শিল্পীর ছোটগল্প এবং সেই গল্পগুলির তুলনামূলক আলোচনার নিরিখে হাস্যরসিক শিল্পী হিসেবে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরার তাগিদেই আমি আমার এই গবেষণার বিষয়টিকে নির্বাচন করি।

আমার এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনে যার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা আমাকে সবসময় সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন তিনি হলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দীপক কুমার রায়।

তিনি বর্তমানে রায়গঞ্জ বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি নানাভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে প্রতিমুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে এবং বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকর্মটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। এছাড়া আরেকজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন অধ্যাপক অক্ষুশ ভট্ট মহাশয়। তাঁর সুপরামর্শ, বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। আমার এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। অনুপ্রেরণা পেয়েছি ঠাকুর পঞ্চানন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক ড. প্রণব ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। তিনি আমাকে ভাইয়ের মত ভালোবেসে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। উৎসাহ দিয়েছেন আমার সহধর্মিণী শ্রীমতি সুলগ্না গুপ্ত। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের গবেষক ভাই শ্রী উজ্জ্বল শীল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রী পরিমলচন্দ্র রায় আমাকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। মালদা জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

উৎসাহ দিয়েছেন গাজোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহম্মদ সামসুল হক মহাশয়। তাঁর উৎসাহ, পরামর্শে আমি বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছি। তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা না পেলে চাকরীরত অবস্থায় আমার এই গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আর সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই খুব অল্প সময়ে মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে যিনি আমার গবেষণাপত্রটিকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন সেই ভ্রাতৃসম সুজিৎ রায়কে। সকলের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা।

মিঠু দেব

মিঠু দেব